চিদাকাশে অবস্থিত হতে পারেন

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ফাদার আঁতোয়ান বলেই আমরা মানুষটার কথা জানতাম, শুনতাম— ছাত্রকালে। আমরা যে সময়ে ছাত্র-জীবন কাটিয়ে অধ্যাপনার দিকে যাচ্ছি, তখন ফাদার আঁতোয়ানের কর্মজীবন, তাঁর রামায়ণ-ভাবনার কথা বারবার আমার বিদ্যাজীবনের পরিধির মধ্যে চলে আসতে থাকে। আমার এ-সাহস ছিল না, আসলে তখনকার দিনে এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের বৈপরীত্যে আমাদের জড়তাও ছিল অনেক বেশি, ফলে এমন সংকল্প করতে পারিনি যে, দেখা করবো রবের আঁতোয়ানের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর লিখিত কীর্তিকলাপ আমার চোখে পড়ছিল, কিন্তু বিদ্যার বহর এত ছিল না যে, তাঁর স্তুতি-নিন্দার কোনোটাতেই উৎসাহিত হতে পারি। তবে কোনোমতেই তার মতে-মননে উদাসীন ছিলাম না বলেই দু-কথা বলার যোগ্যতা লাভ করেছি এতদিনে।

রবের আঁতোয়ান যে সময়ে রামায়ণের ওপর লিখছিলেন, সেই সময়টাকে গুণী পণ্ডিতজনেরা ভারতীয় মহাকাব্য-চর্চার দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে বলে ভেবেছিলেন। সেই সময়ে রামায়ণ-মহাভারত এই দুই বিরাট গ্রন্থের শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। ভারতের পণ্ডিতেরা হাজারো পুঁথি ঘেঁটে, হাজারো বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করছেন এই শ্লোক মূল রামায়ণে ছিল আর এই শ্লোক ছিল না। সেই সব সময়ের মহা-মহা-গুরুগম্ভীর পত্রিকায় এক-একখানি প্রবন্ধ লিখে গবেষকরা সব আশ্চর্য সত্য প্রকাশ করছেন এবং একটি একটি করে প্রক্ষেপ-পঙ্কে নিক্ষেপ করছেন সেই সব রামায়ণী শ্লোক, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, এমনকী গোটা কাণ্ড ধরে ফেলে দিচ্ছেন— যেগুলিকে আমরা এতকাল রামায়ণ বলে বিশ্বাস করে এসেছি।

তাঁদের এই রামায়ণের শুদ্ধিকরণের মহা-ভাবনা কোথা থেকে এল, আমরা সেটা বেশ সহানুভূতি-সহকারে বুঝতে পারি। একটা সময় তো এ-রকম এসেই ছিল যখন ঔপনিবেশিক শাসকেরা আমাদের বেদ-উপনিষদ আর মহাকাব্য নিয়ে খুব হইচই-চর্চা আরম্ভ করলেন। তার মধ্যে এই প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে প্রশংসা এবং গৌরব যতখানি ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল সংশোধনী চেষ্টা। প্রথমত একটা চেষ্টা বেশ উপরিতলেই ভেসে উঠল এবং সেটা হল— আমাদের অতি প্রাচীন বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ গ্রন্থগুলিকে খ্রিস্টজন্মের প্রাসঙ্গিকতায় কতটা অর্বাচীন করে তোলা যায়। ভাষা-ভাবনা এবং বিষয়-ভাবনার নিরিখে প্রাচীন উপনিষদগুলিকেও যখন কিছুতেই খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ শতাব্দীর আগে আনা গেল না, তখন এঁরা রামায়ণ-মহাভারত

নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রসঙ্গে চলে এল তাঁদের মহাকাব্য ইলিয়াড-ওডিসি; টানা-পোড়েন আরম্ভ হল রামায়ণের কাল নিয়ে। রামায়ণের সম্পূর্ণ শব-ব্যবচ্ছেদ করে তাঁরা জানিয়ে দিলেন— রামায়ণের বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড পুরেটাই প্রক্ষেপ এবং অযোধ্যাকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যেও ছোটো-খাটো প্রক্ষেপ একেবারে ভর্তি।

প্রক্ষেপর এই বিরাট পঙ্কের বোঝাটা আমাদের দেশীয় পণ্ডিতজনেরও ভাল লাগেনি। একে তো তাঁরা ঔপনিবেশিক পণ্ডিতদের চিন্তা এবং যুক্তিজালের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, ফলত তাঁদের মধ্যে হীনমন্যতাও কিছু তৈরি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যেও মানুষ রামচন্দ্রকে শুদ্ধ মহাকাব্যিক নিদান হিসেবে তৈরি করার একটা বলবান মানসিকতা তৈরি হল যাতে রামায়ণের বহুলাংশে যেখানে রামচন্দ্রের ওপর ঈশ্বরত্বের আরোপ তৈরি হয়েছে, সে-সব জায়গা ছেঁটে দিয়ে একটি পরিশুদ্ধ রামায়ণ তৈরি করায় ব্রতী হলেন। তাঁরা পৃথক করে দিলেন সেই সব বিখ্যাত কথক-ঠাকুরের কথকতার অংশ, তাঁদের অতিশয়োক্তি, তাঁদের বহুমানন— যা হয়তো পুরাকীর্তিত কুশ-লবের রামায়ণ-গানের কাল থেকে নেমে আসছে আমাদের কাছে। এই সব মহান গবেষক পণ্ডিতদের শেষ বংশধর হলেন জে. এল. ব্রকিংটন, যিনি পাশ্চাত্য গবেষণা 'প্যাটার্ন'-পন্থা প্রয়োগ করে রামায়ণের ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ, উপমার 'প্যাটার্ন' থেকে রূপকের 'প্যাটার্ন' সবই উপনিবদ্ধ করে 'স্টাইলে'র অনন্ত বিভাজন তৈরি করে কোনটা মহাকবির, আর কোনটা কথক-ঠাকুরের সংযোজন, সব একেবার একটি একটি করে আমাদের বুঝিয়ে আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের হাজারো গবেষককুল বিস্ময়-মুকুলিত-নেত্রে জয়কার ঘোষণা করলেন সাহেবের— যিনি ক্রৌঞ্চবিরহীর কবি-মানস তথাকথিত প্রক্ষেপক কথকঠাকুরের চাইতে হাজার গুণ কম বোঝেন।

রামায়ণ-গবেষণার এই যে মূল-বিধ্বংসী ধারা, যার চরম অপব্যাখ্যা আমাদের অতি-করুণার্হ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত— এই সম্পূর্ণ ধারার মধ্যে যিনি স্নিগ্ধ প্রদীপের মতো দীপ্যমান হয়ে ওঠেন, তিনি আমাদের এই ফরাসি সাহেব— রবের আঁতোয়ান। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— সেই কলঙ্কে/নিন্দাপঙ্কে/তিলক টানি— রবের আঁতোয়ান এই শত গবেষকের নিন্দাপঙ্কে তিলক টেনে কবি কথকঠাকুরদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'পৌরাণিক' সংবেদনশীলতা বা সহৃদয়তা বলে কিছু আছে যা না থাকলে প্রাচীন মহাকাব্যপাঠে ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবীয়। আঠারো শতকের চিত্তমুক্তি আন্দোলন এবং উনিশ শতকের যুক্তিবাদের লক্ষ্য যতোই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা মানুষের মুক্তি হোক না কেন, দুঃখের বিষয় তা মানুষের পৌরাণিক ভাবধারার জীবন্ত নির্ঝরকে শুকিয়ে ফেলেছে। 'অলৌকিক' সম্পর্কে স্বাভাবিক ঘৃণার বশে নায়কের ঐশ্বরিক পিতা-মাতার যে কোনো উল্লেখকেই তাঁরা 'বাজে' বলে চিহ্নিত করেন। কেতাবি-সমালোচনার ক্ষেত্রে এইসব যুক্তিবাদী গবেষকরা যেভাবে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আসল রামায়ণ উদ্ধার এবং পাঠ-নির্ধারণ করেছেন বলে দাবি জানান, তাতে এই সত্য গোপন রাখা মুশকিল যে তাঁদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপনীত সিদ্ধান্তগুলি আসলে পূর্ব-নির্ধারিত অনুমানের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁদের মনে, এই অনুমানগুলি এতোই স্পষ্ট লক্ষ্য যে, তাঁরা খোলাখুলিভাবে বলেন যে, খাঁটি পাঠ-নির্ধারণে এই রীতি অভ্রান্ত। তাই ড. মূর বলেন : বোম্বাই

সংস্করণে ('রামায়ণ', বোম্বাই সং. ৩, ২৪, ১৯) ভগবান এবং দর্শকদের মুখে যে ভাষণ দেওয়া হয়েছে, সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন এবং খাঁটি, কেননা তাতে রামের দেবরূপের কোনো উল্লেখ নেই। এই অনুমানের অর্থ হল যতক্ষণ না নায়ককে মানবিক মাত্রার মধ্যে ধরা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা খাঁটি নয়। এখানে দুটি আলাদা বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। প্রথমত, নায়ককে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে মনে করা অথবা তার সম্ভাব্যতা স্বীকার করা। একথা কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন : যারা প্রথম সেই নায়কের কার্যাবলির স্তুতিগান করেছিল, তারা কি তাঁকে শুধু একজন মানুষ হিসেবেই দেখত? সেই সব স্তুতিগায়কেরা কি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী চিল যাদের কাছে এটা রোমান্স কাহিনিমাত্র ছিল? পরে কি তারা ধূর্ত পুরোহিতদের মায়াজালে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে রাম বিষ্ণুর অবতার ছিলেন? উৎসাহী সমালোচকেরা 'নৈর্ব্যক্তিকতা'র খাতিরে যেভাবে গল্পের কাঠামোকে দাঁড় করিয়েছেন, সেই রূপে 'রামায়ণ' কাহিনির আদৌ অস্তিত্ব ছিল কিনা তার কি কোনও প্রমাণ আছে? তাঁদের কথিত কাহিনি এইভাবে দাঁড়াবে : কোনও এক সময়ে, অযোধ্যার রাজপুরীতে রাম নামে এক যুবরাজ ছিলেন। বিমাতার দুর্মতিতে তিনি কিছুদিনের জন্য অরণ্যে নির্বাসিত হন। তিনি তাঁর সহধর্মিনী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে গমন করেন। বনবাসকালে এক দ্বীপবাসী বর্বর উপজাতির গোষ্ঠীপতি সীতাকে হরণ করে। মিত্রপক্ষীয় উপজাতিদের সাহায্যে, যাদের গোত্রচিহ্ন ছিল বানর এবং ভল্লুক, রাম তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করেন এবং হরণকারীকে হত্যা করেন। তিনি অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং বহু বছর সুখে রাজত্ব করেন।

এই 'খাঁটি' রামায়ণ যে কতখানি ভুয়ো তা বুঝতে হলে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে এবং প্রাচীন দর্শকবৃন্দ কীরকম মনোভাব নিয়ে রামের মহিমামুখের মহাকাব্যগান শুনতেন তার অংশ নিতে হবে।

ফাদার রবের আঁতোয়ান-এর লেখা থেকে আমি এতটা উদ্ধার করলাম এইজন্য যে, তাঁর মতো এমন সুন্দর এবং সহজ করে ভারতবর্ষের কবি-পরম্পবাহী সংসারটুকুকে আপন হৃদয় দিয়ে ক-জন গবেষক বুঝতে পারবেন। এককালে দুই জার্মান পণ্ডিত হ্বেবার আর জ্যাকোবি রামায়ণ মহাকাব্যের শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছেন এবং এ-কালেও তাঁদের পদলেহী গোষ্ঠীর অবশেষ থেকে গেছেন অনেকেই। যাঁরা সাহিত্যের ইতিহাস লিখে নাম কেনেন, তাঁরা যদি কেউ দীনেশ সেন-এর মতো পণ্ডিত হতেন তাও বুঝতাম, কিন্তু কিথ সাহেবের রামায়ণী প্রবচন শুনে উদ্বুদ্ধ হবো এমন ঔপনিবেশিক খোঁয়াড় আমার নেই অন্তত। আর আছেন আমাদের দেশের বিষয়ানভিজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্যেরা— যাঁরা রামায়ণের শম্বুকবধ এবং সীতা-পরিত্যাগের উত্তরকাণ্ডীয় ঘটনা নিয়েই রামচরিত্র তোলপাড় করে ফেলেন, আবার নিবিড় মুরগীপালন সম্বন্ধেও মতামত দেন— এঁরা সর্বজ্ঞ, এঁরা সব জানেন— এঁদের মতো ভয়াবহ স্বকপোল-কল্পবিজ্ঞানীদের গোক্ষুরে আমার নমস্কার রইল, এমন আক্ষরিক গো-এষণা সহজে মেলে না।

এঁরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনটারন্যাশনাল রিলেশনস পড়ান, কেউ বা ইকোনোমিকস। তাঁরা রামায়ণের প্রক্ষেপ নিয়ে ভারী ভারী মতামত দেন এবং তাঁদের প্রতিবাদ করলে বলেন— রামায়ণ কী কারো বাপের সম্পত্তি?

আমি বলেছিলাম— সত্যিই এটা বাপের সম্পত্তি। আমার-আপনার সকলেরই বাপের সম্পত্তি এবং এখানেই সমস্যা। স্বোপার্জিত নয় বলেই বাপের সম্পত্তি নয়-ছয় করার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে সন্তানদের মধ্যে। আপনাদের মতো সন্তানেরাই রামায়ণের মতো কবি-সম্পত্তির মূল্য না বুঝে অযোগ্য লোকের মধ্যে সম্পত্তিভাগের জন্য উকিল ডেকে এনেছেন। আপনাদের এক উকিল হ্বেবার সাহেব বলছেন— দ্যাখো বাপু রামায়ণ-কাহিনির সঙ্গে হোমারের ইলিয়াডের বড়ো মিল আছে। দুই মহাকাব্যেই এক দেশের রাজার স্ত্রীকে আরেক দেশের রাজা হরণ করেছে। আমি বললাম— হেলেনকে আবার হরণ করল কে? ওটাকে কী হরণ বলে? হেলেন তো স্বামী-পুত্র ছেড়ে নিজের মোহেই নিজে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তুলনীয় হবেন সীতা? লঙ্কার প্রাকারের বাইরে এবং ট্রয়ের প্রাকারের বাইরে যুদ্ধ-বর্ণনা আছে দুই মহাকাব্যেই। অতএব 'রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় পরিবেশে ইলিয়াডের ছায়া অবলম্বনে রচিত, হয়ত বা কিছুটা ওডিসির ছায়াও থাকতে পারে।' এবং ভুলিয়ো না, 'জার্মানীর বিশিষ্ট রামায়ণ বিশেষজ্ঞ ডঃ অ্যালব্রেকট ওয়েবার এই মত পোষণ করতেন।'

১৯৮৮ সালের একটি প্রবন্ধে এইসব বোকা-বোকা কথা লিখেছিলেন অন্য-বিষয়জ্ঞ এক পণ্ডিত এবং তাঁর এই গবেষণা-প্রবন্ধ পড়ে অন্যতর অবিষয়জ্ঞরা দারোগার চেয়েও অনেক বেশি চৌকিদারের এলেম দিয়ে কথা বলতে থাকলেন। এঁরা কেউ জানেনই না যে, হ্বেবার-এর (ওই পরোচ্ছিষ্টভোজী পণ্ডিতের ভুল উচ্চারণে 'ওয়েবার'-এর) মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; যিনি যুক্তি দিয়ে এটা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আবার এই পণ্ডিতমানী লিখেছেন— তিনি নাকি 'স্বাদেশিককতায়' উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কাজ করেছেন। যেন স্বাদেশিকতা বিরাট একটা অন্যায় কাজ। ভারতবর্ষের আদিকবিকে বোঝা তো দূরের কথা, তাঁর ক্রৌঞ্চবিরহী মনের ব্যাপ্তি অনুভব করা যাঁদের বিদ্যা এবং বুদ্ধি দুয়েতেই কুলোবে না তাঁদের কাছে প্রামাণিক হন খাল্লাদী ভেঙ্কটরত্নম-এর মতো লোক, যাঁর দু-খণ্ড বই পড়লে আপনার প্রত্যয় হবে— 'রাম ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মিশরের সবচেয়ে বিখ্যাত ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিস, সীতা ছিলেন ইখনাতোনের ভগ্নী সীতামন, আর রাবণ ছিলেন একজন হিটাইট রাজা।' এই জাতীয় লোকের আর এক প্রামাণিক হলেন নীরদ সি. চৌধুরী— তিনি একশ বছর ধরে নিবিড় মুরগী পালনের পদ্ধতিই বড়ো বড়ো মতামত দিলেন।

ফাদার আঁতোয়ান এঁদের প্রত্যাখ্যান করার কথাও ভাবেননি। এতই স্নিগ্ধ তাঁর লেখনী, এতই সযৌক্তিক তাঁর মন যে, আগন্তুক এই সব অপ্রামাণিক উৎপাত নিয়ে তিনি মাথাও ঘামান না। তাঁর কাছে— 'লোক-ঐতিহ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রবহমানতা। বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠে একই গান বিভিন্নরূপ পায়— শুধু তাই নয়, একই গায়কও কখনোই একই গানের একই ভাবে পুনরাবৃত্তি করেন না।... তিনি কখনোই দাবি করেন না যে গানগুলির তিনিই 'স্রষ্টা' : তিনি এগুলি পেয়েছেন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, যেমন পেয়েছেন গায়নপদ্ধতি। তিনি হচ্ছেন জনসাধারণের স্বাভাবিক স্মৃতির প্রতীক। স্মৃতি বলতে এখানে বোঝান হয়েছে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যকে, কেবল আক্ষরিক পুনরাবৃত্তিকে নয়। গায়ক ইচ্ছেমতো তাঁর অনুষ্ঠানকে দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত করতে পারেন, তাঁর মূল কাহিনিতে নতুন আখ্যান যোগ

করতে পারেন এবং সাধারণভাবে শ্রোতাদের মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী তাঁর গানকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। গায়কের কাছে গানের সেই অংশটাই অপরিবর্তনীয়, যেটি হল মুল কাহিনির সার (নয়তো তাঁর কাছে মনে হবে সমস্তটাই বানানো গল্প অথবা মিথ্যা ইতিহাস)। তিনি [শুদ্ধরূপ] সংরক্ষণে বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান, তবে তা অক্ষরের অভিন্নতার উপর নির্ভর নয়। কেননা তাঁর কাছে শব্দ-প্রয়োগ কখনোই [অচল] স্থির মনে হয় নি। যেমন নয় কাহিনির অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলি।'

মহামান্য গবেষকরা যদি একবারও বুঝতেন যে, তৎকালীন দিনের সূত-মাগধ-বন্দীরা রামচরিত্র গান করতেন এবং রামায়ণ মহাকাব্যটাও গান করার জন্যই তৈরি হয়েছিল এবং এই ভাবনাটা রামায়ণের আদিপাদেই ভাবিত। প্রক্ষেপবাদীরা তো রামায়ণের আদিকাণ্ডটাকেই তো বাদ দিয়ে দিলেন, ফলত কোন অতল গর্ভে চলে গেল রামায়ণের সেই শোক-শ্লোক— মা নিষাদ— যে শ্লোক শুনে আনন্দবর্ধনের মতো রসশাস্ত্রকার সোচ্ছ্বাসে লিখেছেন— ক্রৌঞ্চবিরহে বাধিত হৃদয় মহাকবির শোকই শেষ পর্যন্ত শ্লোকে পরিণত হল— শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ। আর আমার চির জনমের সখা যে মহাকবি তিনি তো বাল্মীকি নামটার বদলে বিশেষণের শ্রেষ্ঠ বিশেষণটা লাগিয়ে আদিকবির নাম দিলেন— ক্রৌঞ্চবিরহী কবি।

তবে কিনা আমার কাছে 'মা নিষাদ'— শ্লোকের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ লাগে শোকে ভেঙে-পড়া তপ্তবুদ্‌বুদোপম হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা আদিকবির আপন উচ্ছ্বাসটুকু— যে উচ্ছ্বাস শুধু প্রথম অনুষ্টুপের ছান্দসিক তাড়না নয়— শ্লোক সেখানে গান হয়ে উঠেছে। 'মা নিষাদ' উচ্চারণ করেই বলেছেন— এ আমি কী বললাম— কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া— এ আমি কী উচ্চারণ করে ফেললাম! যা বলেছি তার মধ্যে প্রত্যেক পংক্তিতে সমান সংখ্যার অক্ষর আছে, চারটে করে পংক্তি আছে আর আছে বীণার তারে বাঁধা লয়— এটাকেই তো শ্লোক বলে। রামায়ণ-গানের বীজ কিন্তু এইখানেই। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের শেষে আদিকবি তাঁর দুই শিষ্যকে নিয়ে রামচন্দ্রের রাজধানীতে এসেছেন। গানের গুরু বাল্মীকি রামচন্দ্রের ছেলেদেরই গানে তালিম দিয়েছেন। রাজধানীতে পৌঁছে যাজ্ঞিক ঋষিদের কাছ থেকে শকট-ভর্তি ফল পেয়েছেন বাল্মীকি, শিষ্যদের বলেছেন— আর চিন্তা রইল না কোনো। ঋষিদের আশ্রমেই হোক আর ব্রাহ্মণদের ঘরেই হোক, রাজভবনে, রাজপথে, রামচন্দ্রের ঘরের সামনে গিয়ে এই রামায়ণ গান করবে। এক গাড়ি ফল পেয়েছো, খাবে আর গান করবে, বীণার তন্ত্রী সেধে সুর-লয় সৃষ্টি করে গান গাইবে— আস্বাদ্যাস্বাদ্য গায়তাম্। গায়তাং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।

আমাদের শাস্ত্রকারদের একটা ভাবনা আছে অথবা যে ভাবনা দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ হয় সেই ভাবনা দিয়েই গ্রন্থ শেষ হয়। যেমন ধরুন, ভগবদ্‌গীতায় দুই পক্ষের সৈন্যমধ্যে দাঁড়িয়ে অর্জুন-বিষাদ-যোগ দিয়ে গীতা শুরু হচ্ছে, কিন্তু গীতার সমস্ত উপদেশের শেষে অর্জুন কৃষ্ণকে বলছেন— এখন আমার সমস্ত মোহ চলে গেছে, আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সমস্ত বোধ ফিরে পেয়েছি— নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। অর্থাৎ সমস্যার সমাধান ঘটছে। আবার রামায়ণের ক্ষেত্রেও দেখুন— আদিকবি তাঁর শোকোৎপন্ন শ্লোক থেকে নিজেই উচ্ছ্বসিত

বোধ করছেন, অবশেষে শ্লোকরাশি সমন্বিত সম্পূর্ণ রামায়ণ কাব্যখানা সম্যক প্রচারের জন্য হাটে মাঠে, গৃহে বাটে সর্বত্র তিনি গান গাইতে বলছেন।

রবের আঁতোয়ান রামায়ণের এই 'গেয়'-স্বরূপের মর্যাদা বুঝেই পরম্পরাবাহী সূত-মাগধ গায়কদের প্রতি পৌরাণিক সহৃদয়তায় মুগ্ধ হন এবং তাতে মহাকাব্যের অতিজাগতিক ঘটনাগুলিও যেমন শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে, তেমনই রামচন্দ্র কিংবা রামায়ণের অন্যতম বিশাল চরিত্রগুলির মানবায়নের মধ্যে তা মিশে যাওয়ায় প্রতীত তথা প্রত্যয়যোগ্য কাহিনিগুলিও পৌরাণিক সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। এই যেমন ধরুন, রামায়ণের আদিতে অপুত্রক দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য তাঁর জামাই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়ে আসা হচ্ছে— এই ঘটনাকে রবের আঁতোয়ান উৎসুক শ্রোতার সামনে গায়কের নবনবায়মান অভিনবত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন। অত্যুৎসাহী এবং পরক্ষেত্রে বিচরণশীল অর্বাচীন কিছু সস্তা লেখক আত্মলাভের কারণে দশরথের চারটি পুত্রকেই ঋষিশৃঙ্গ মুনিরই পুত্র বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এটা তিনি একবারও ভাবলেন না যে, জামাই দিয়ে তাঁর শাশুড়ির গর্ভে পুত্র উৎপাদন করার চেষ্টাটা তাঁর আপন কল্পগৃহের উদার অবভাসচিহ্ন বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যের বৈচিত্র্যময় যুগে 'মহাকবির কল্পনাতেও ছিল না সেই ছবি।'

ফাদার আঁতোয়ান রামায়ণের সেইসব প্রসারিত কাহিনিগুলির প্রতি কতটা তীক্ষ্ণভাবে উদার যে, যারা সেইসব কাহিনিগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মহাকবির সম্প্রদায়টাকেই অপমান করেন, তিনি তাদের পৌরাণিক সত্যের মধ্যে অবস্থিত করে দেন। শুধু ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি নয়, দশরথের চারপুত্রের জন্মের মধ্যে যে অলৌকিকত্ব আছে, সেটাকেও কী অসামান্য কাব্যিক সমান হৃদয়তায় প্রতিষ্ঠা করেন রবের আঁতোয়ান— দশরথের পিতৃত্ব তাই মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ সত্ত্বেও সমস্ত ঐহিকতা অতিক্রম করে সময়হীন অতীতে প্রক্ষিপ্ত। বিষ্ণুর অভিপ্রায়ের পটভূমিতে সনৎকুমারের ভবিষ্যদ্বাণীও বিশেষ [দৈব] উদ্দেশ্যসিদ্ধির কথা স্পষ্ট করে। এই পৌরাণিক বিস্তার প্রাচীন মৌখিক ঐতিহ্যের একটি বিশেষ লক্ষণ:মানবিক ও ঐহিক বাস্তব দর্শনের মতো, যা ক্ষণ-মুহূর্তের মধ্যে প্রতিফলিত করে সময়হীন পৌরাণিক প্রতিরূপকে।

আমি আরো অবাক হয়ে গিয়েছি এই ভেবে যে, কত দূর এক অজানা নগরী থেকে রবের আঁতোয়ান কলকাতা শহরে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। এখানে বসে সতত তাঁর মনে পড়ার কথা ছিল জন্মভূমির সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির কথা। তিনি তাঁর আপন ধর্ম, আপন সংস্কৃতি এবং আপন মহাকাব্যকে কখনো অবমাননা না করেও সেগুলিকে কীভাবে সেগুলির উৎকর্ষ-নিষ্কর্ষ মিশিয়ে দিলেন ভারতবর্ষের এই অন্যতম মহাকাব্যের সঞ্চরমান ঐতিহ্য বোঝবার জন্য। শব্দ-প্রতিজ্ঞা, অভিশাপ-বর, সৎ এবং অসৎ সম্বন্ধে যে বিচারগুলি রবের আঁতোয়ান করেছেন এবং সেগুলিকে যেভাবে প্রতিপন্ন করেছেন রামায়ণের মূল কাহিনি থেকে উঠে আসা উৎপন্ন কাহিনির মধ্যে তাতে আমি এটা বুঝতে পারি যে, কোনো উন্নাসিকতা নয়, কোনো উচ্চমানিতা নয়, কতখানি জ্ঞান এবং উপলব্ধি থাকলে একটি মানুষ এত স্নিগ্ধ এবং এত উদার বৈরাগ্যময় এক চিদাকাশে অবস্থিত হতে পারেন।